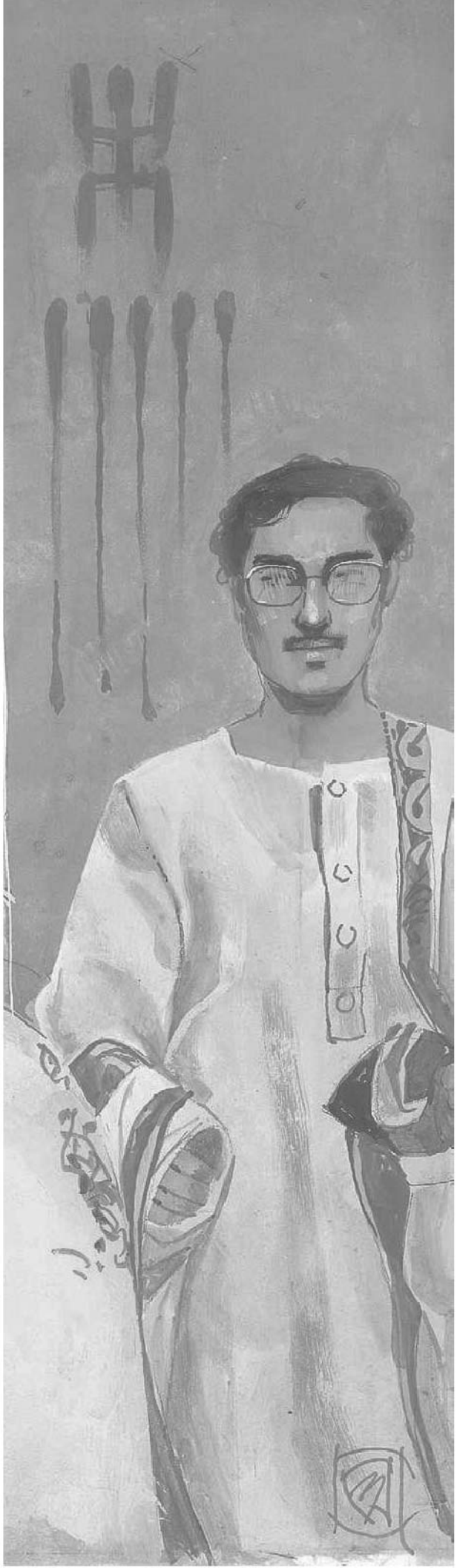

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

হারায় না তো কিছু

ভাড়া করা বিয়েবাড়ির সামনেটায় দাঁড়িয়ে কাজকর্মের তদারকি করছিল প্রতীক। জ্বালাচ্ছে বটে ডেকরেটার, এখনও গেটের খাঁচাই শেষ হল না! বাবুদের হাত চলছে দ্যাখো, যেন কাশ্মীরি শাল বুনছে! তার উপর পাঁচ মিনিট বাদে বাদে বিড়ি-ব্রেক। এগারোটা তো বাজল, এরপর কখন ফুল দিয়ে সাজানো হবে, কখনই বা আলো-টালোগুলো লাগাবে...ইলেকট্রিকের লোকটাও আজ ঝোলাবে নির্ঘাত। সেই যে সাতসকালে হ্যালোজেন, টিউবলাইট আর টুনি বালবের পাহাড় ঢুকিয়ে দিয়ে কেটে পড়ল...এখন কোথায় খেপ খাটছে কে জানে!

নাহ্, পয়সা ঢেলেও স্বস্তি নেই। প্রতীক পইপই করে বলেছিল, এমন একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হোক, যেখানে সাজানো-ফাজানোর কোনও হ্যাপা নেই, স্রেফ ডিজ়াইন ফেলে দিয়ে খালাস, তারাই সব কিছু করে দেবে। তা সংসারে প্রতীকের কোনও মত টিকলে তো! রঞ্জনার এই বাড়িই পছন্দ। কোত্থেকে শুনেছে এখান থেকে বিয়ে হলে বর-কনের সুখ নাকি উথলে পড়ে! এমন উদ্ভট ধারণাগ্রস্ত মেয়েমানুষকে নিয়ে এক ছাদের নীচে বাস যে কী দুরূহ!

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল প্রতীক। অজান্তেই একখানা উঠে এল ঠোঁটে। নেশাটা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, গতকাল থেকে ফের চাগিয়ে উঠেছে। যাকগে, মিমলির বিয়ের অনারে ফুসফুসে না হয় খানিকটা বিষই ঢুকল।

কথাটা মনে হতেই ফের বুক চিনচিন।

মিমলির বিয়ের দিনটা শেষ পর্যন্ত এসে পড়ল! এসেই পড়ল?

অন্দরে তুমুল শোরগোল। উলুধ্বনি আর শাঁখের নিনাদে বিয়েবাড়ি মাত-মাত। মিমলির গায়েহলুদ হচ্ছে বোধহয়, প্রমীলাকুলের হিহি হো-হো ঠিকরে ঠিকরে আসছে। সব্বাইকে ছাপিয়ে যাচ্ছে বড় শালি। হাসিখানা রঞ্জনারই মতো। পাড়া-কাঁপানো। প্রতীক একবার ভিতরে উঁকি মেরে আসবে নাকি? ধুস, ভাল লাগছে না। মেয়েটাই পর হয়ে যাচ্ছে...!

মন খারাপটুকুর মাঝেই হঠাৎ রঞ্জনার আবির্ভাব। হন্তদন্ত পায়ে কাছে এসে বলল, “এখানে ঘটের মতো দাঁড়িয়ে কেন?”

সকালবেলাই দিব্যি সেজে নিয়েছে রঞ্জনা। পরনে লালপাড় সাদা ঢাকাই, কানে ঝোলা দুল, গলায় মপচেন, হাতে বাউটি। কাল সন্ধেবেলা মেয়ের সঙ্গে বসে মেহেন্দি পরেছিল, এখন গালে হলুদের ছোপ।

ট্রলি টানতে টানতে রুনু পত্রপাঠ অন্দরে। সৌমেন অবশ্য ঢুকল না, রয়ে গেল বাইরে। বোধহয় প্রতীককে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই। পাশে এসে লঘুস্বরে বলল, "কী ব্যাপার, তোমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কেন?"

সিঁদুরটাও পরেছে চওড়া করে।
বউকে আলগা জরিপ করে নিয়ে প্রতীক বলল, "আমার তো সাজগোজ আর হ্যা-হ্যা হি-হি নিয়ে থাকলে চলে না, আসল কাজগুলো দেখতে হয়।"
"বটেই তো। ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে সিগারেট ফোঁকাটাও তো একটা কাজ...তোমার ভিডিওর লোকটা কোথায়, অ্যাঁ?"
"সে তো ও বেলায় আসবে, পাক্কা পাঁচটায়।"
"মানে! গায়েহলুদের ভিডিও উঠবে না?"
"আশ্চর্য, তোমার সামনেই তো ছেলেটার সঙ্গে কথা হল!"
"বাজে কথা। ভিডিওর কাউকে আমি চোখে দেখিনি। তুমিই বারফাট্টাই করে বলেছিলে, ও সব নিয়ে ভাবতে হবে না, সব ফিট করা আছে।"
"তখন তোমায় বিকেলে আসার কথাটাও বলেছিলাম, মোটেই আপত্তি করোনি...যাকগে, পাপান তো স্টিল ফটো তুলছে, ওতেই হবে।"
"এই না হলে মেয়ের বাবা! গায়েহলুদের তত্ত্ব এল, ক্যামেরা চলল না! এখন মেয়ে কলাতলায়, তারও কোনও ইয়ে থাকছে না! সিডিটাই তো আধাখেঁচড়া থেকে যাবে।"
প্রতীক খুব বুঝতে পারছিল একটা বিচ্ছিরি ভুল হয়ে গেছে। তবু হার-না-মানা স্বরে বলল, "ও আমি ম্যানেজ করে দেব। স্টিলগুলোই জুড়ে জুড়ে ভিডিওতে..."
"ম্যানেজ করে করেই তো জীবন কাটল।" রঞ্জনা গজগজ করতে করতে চলে যাচ্ছিল, কী ভেবে ঘুরেছে। চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "জলখাবার খেয়েছ?"
"হ্যাঁ, পেটে লুচি গজগজ করছে।"
"আর তোমার প্রেশারের ট্যাবলেট?"
"আমার পিছনে পড়লে কেন? বিয়েবাড়িতে আর কোনও কাজ নেই?"
"কোথায় আর! সারাক্ষণ তোমার মতো গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কি না!" ঠেস না দিয়ে কি একটা সেন্টেন্স বেরয় না মুখ দিয়ে? প্রতীক গোমড়া গলায় প্রশ্ন করল—"দাদা কি নান্দীমুখে বসেছে?"
"শেষ হতে চলল। দাদাভাই তোমার মতো নন, সমস্ত নিয়ম নিষ্ঠাভাবে পালন করছেন। উনিই তো ঠাকুরমশাইকে তাড়া দিয়ে বসালেন।"
"ও...তা এখানে লেকচার না ঝেড়ে, গিয়ে দাদার একটু দেখভাল করলে তো পারো। মিমলিকে সম্প্রদান করবে বলে উপোস করছে, ঠিকঠাক শরবত-টরবত বানিয়ে দাও।"
"সে খেয়াল আমার আছে স্যর। তোমায় জ্ঞান দিতে হবে না।"
আপাতত মধুবর্ষণের বিরতি। ভিতরে ছুটল রঞ্জনা। সিগারেটের শেষটুকু ফুটপাথের লাগোয়া নর্দমায় ছুঁড়ে দিয়ে তুম্বো মুখে দাঁড়িয়ে রইল প্রতীক। চোখ ডেকরেটারের কর্মকাণ্ডে। খাঁচা তৈরি সমাপ্ত, এবার শোলার নকশা সাঁটা হচ্ছে তাতে। মন্দ লাগছে না চেহারাটা। ফুল-টুলে সেজে খাড়া হলে ভালই খুলবে।
সামনে একটা ট্যাক্সি। রুনু, সৌমেন নামছে। সঙ্গে ছোট্ট ট্রলিব্যাগ। তুলতুল কোন সকালে পৌঁছে গেছে, বাপ-মায়ের এতক্ষণে দর্শন মিলল।
অনুযোগের সুরে প্রতীক বলল, "কী রে, তোরা কালও লেট করলি, আজও লেট? সবাই তোদের খুঁজছে।"
"আর বলিস না রে ছোড়দা, শিবপুর থেকে রোজ ছুটে ছুটে আসা কি মুখের কথা! তার ওপর রাস্তায় যা জ্যাম!"
বোনের বলার ভঙ্গিতে সামান্য হোঁচট খেল প্রতীক। কাল কি রুনুদের থেকে যেতে বলা উচিত ছিল? কিন্তু ওইটুকু তো ফ্ল্যাট, তিন-চারটে বাড়তি লোকেই থই থই। বেশি মাথা বাড়লে, কাকে কোথায় ঠাঁই দেবে? কয়েকদিনের জন্য একটা বাড়ি-টাড়ি ভাড়া নিলে হত। ধুৎ, ভুল হয়ে গেছে।
আলগা হেসে প্রতীক বলল,"একটু আগে আগে বেরবি তো।"
"সে উপায় কি আছে রে! তোর ভগ্নিপতির যা গদাইলশকরি চাল। সকালে কোন ছাত্রীর ফোন এল, তার সঙ্গে কথাই আর ফুরোয় না, গল্পোই করে যাচ্ছে!" রুনু ব্যস্তসমস্ত মুখে বলল, "গায়েহলুদের কদ্দূর রে?"
"ওভার। যা-যা, তাড়াতাড়ি যা, গিয়ে তোর বউদির ঝাড় খা।"
ট্রলি টানতে টানতে রুনু পত্রপাঠ অন্দরে। সৌমেন অবশ্য ঢুকল না, রয়ে গেল বাইরে। বোধহয় প্রতীককে সঙ্গ দেওয়ার জন্যই। পাশে এসে লঘুস্বরে বলল, "কী ব্যাপার, তোমাকে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে কেন?"
"আমার দারোয়ানেরই চাকরি। প্লাস, সুপারভাইজ়ারের পোস্টটাও পেয়েছি।"
"সে কী? কাজ তো ছেলেছোকরারা করবে। তোমার তো আজ ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে বসে থাকার দিন।"
"তারাও করছে। বান্টিদের বলেছি ঘর-টরগুলো অরগ্যানাইজ় করতে। ওরা বোধহয় চেয়ার-টেয়ার পাতছে। আর ভোম্বল...মানে আমার শালার ছেলেটাকে...পাঠালাম দুপুরের দই-মিষ্টি আনতে।"
"কেন? গায়েহলুদের তত্ত্বে দই-মিষ্টি আসেনি?"
"ওরা ওদের মতো দিয়েছে। ঝুড়িভর্তি ফল, বাক্স বোঝাই ড্রাইফ্রুট, আর গাদাখানেক লাড্ডু, বরফি। একে অবাঙালি, তায় দিল্লিবাসী। বাঙালিদের কী দিতে হয়, ওরা থোড়াই জানে। রঞ্জনা মজা করে বলেছিল, বিয়ের দিন মছলি ভেজতে হয়... শুনে বেয়ান মূর্ছা যায় আর কী।"
"যাহ্ বাবা, দুপুরে তা হলে মুড়িঘণ্ট নেই!"
"সে খাওয়ার সময়ে দেখোখন।"
"বুঝলাম...তা বরযাত্রীরা সব্বাই পৌঁছে গেছে? কাদের যেন বেঙ্গালুরু থেকে আজ সকালের ফ্লাইটে..."
"ন'টায় ল্যান্ড করেছে। রোহনের মামা-মামি। ভুটকান গিয়েছিল রিসিভ করতে। দশটার মধ্যে তুলে দিয়েছে বাইপাস কানেক্টরের গেস্ট হাউসটায়।"
"ওরা তা হলে মোট ক'জন হল?"
"আঠাশ। বারোখানা রুম নিয়েছিলাম, সব ক'টাই লেগে গেল।"
"কালই তো ওরা মিমলিকে নিয়ে দিল্লি ব্যাক করবে, তাই না?"
"হুম্।"
প্রতীক ফের উদাস। যে ভাবনাটা ভুলে থাকতে চায়, সেটাই কেন যে স্মরণ করিয়ে দেয় লোকে? আজ রাত্তিরেই রোহনের হাত ধরে মিমলি ড্যাংডেঙিয়ে চলে যাবে, ভাবলেই গা'টা কেমন হিম হয়ে আসে। সাতাশ বছর ধরে সংসারটাকে ভরিয়ে রেখেছিল মিমলি, আজ তা শূন্য হয়ে যাবে এক লহমায়। ভয়ঙ্কর রকমের ফাঁকা। কী নিয়ে তখন থাকবে প্রতীক? ওই সারাক্ষণ ট্যাকট্যাক করা বউ?
"মেসো, কাপটা ধরো।"
পলকের ভাবনা ছিঁড়ে গেল। ট্রেতে সাজিয়ে চা এনেছে পিউ, প্লাস্টিকের কাপে।
সৌমেনও একটা চা তুলে নিল। চুমুক দিয়ে বলল, "ভিতরে এখন কী চলছে?"
"বিয়েবাড়িতে যা হয়। বছর পঁয়ত্রিশের গিন্নিবান্নি পিউ মুচকি হাসল—হাসাহাসি, হট্টগোল, লেগপুলিং..."
"অর্থাৎ বেশ জমে গেছে, অ্যাঁ?"
"তোমরাও ভিতরে চলো না।" পিউ টানল প্রতীককে—"একবার গিয়ে দ্যাখো, মিমলিকে কী মিষ্টি লাগছে।"
কলাতলা বানানো হয়েছে পিছনভাগের

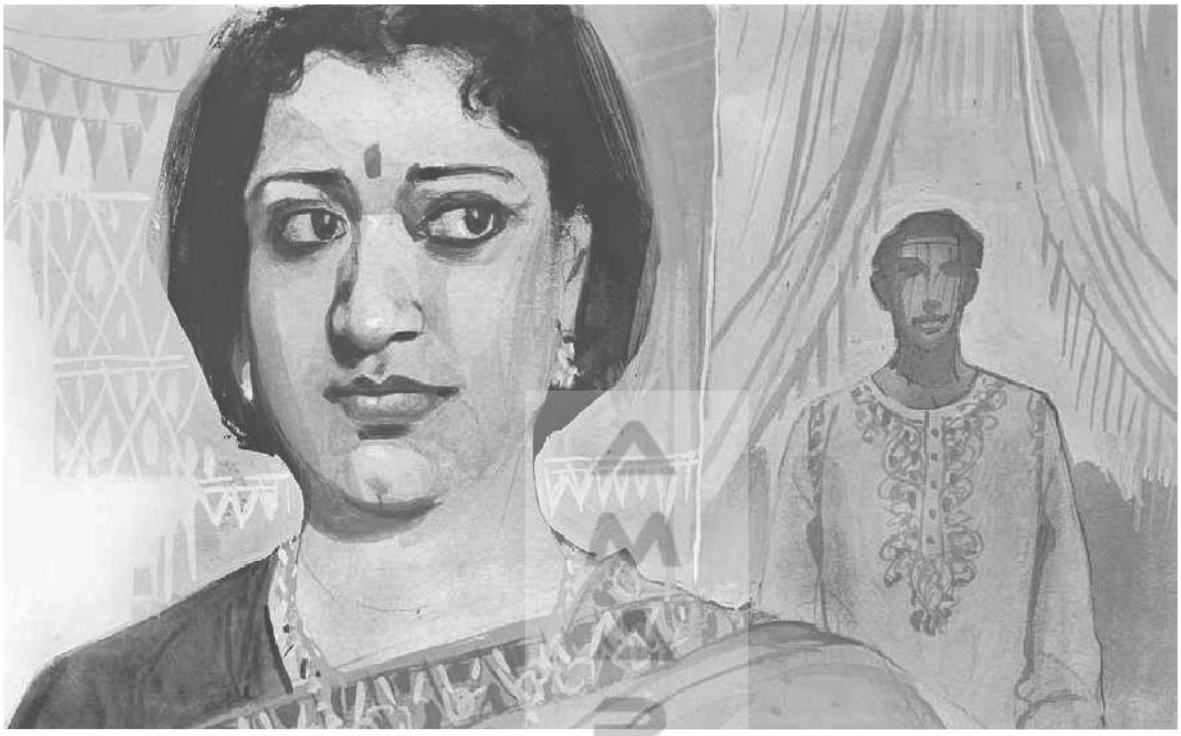

বাঁধানো জায়গাটায়। সেখানে লাল সুতোর ঘেরাটোপে, ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে মিমলি। অঙ্গে একটি বাসন্তী রঙের খড়মড়ে শাড়ি, ভিজে চুপসে ইয়া ফুলে রয়েছে কাপড়টা, রীতিমত বেঢপ দেখাচ্ছে ছিপছিপে মিমলিকে। আর মুখখানা দেখে তো মনে হয় এইমাত্র দোল খেলে ফিরল। শুধু বাঁদুরে রঙের পরিবর্তে জ্যাবজেবে হলুদ, এইটুকু যা তফাত। তেল-হলুদের ঝাঁঝে চোখটাও খুলতে পারছে না বেচারা।

প্রতীক বোকা বোকা মুখে জিজ্ঞেস করল, "কী রে মিম, খুব জ্বালা করছে?"

অতি কষ্টে চোখের পাতা সামান্য ফাঁক করল মিমলি, "ইটস ও কে বাবা...শুধু এদের হাত থেকে এখন ছাড়া পেলে বাঁচি।"

অমনই চারদিক থেকে কলকল ঢেউ। খলখল হাসি।

...এক্ষুনি মুক্তি কী রে? এই তো সবে শুরু! ...বহু ধৈর্যং, বহু ধৈর্যং, কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

...মুখে আর একটুক্ষণ হলুদের প্যাকটা রাখ, সন্ধেবেলা স্কিন দারুণ গ্লো করবে।

...আমাদের জন্য বলছি না, তোমার রোহন মুগ্ধ হবে বলেই বলা।

...শুধু মুগ্ধ? রোহনকুমার ভিরমি না খায়! উফ্, কী টর্চার, কী টর্চার! প্রতীকের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "অ্যাই, এবার ওকে ছাড়ো তো সবাই। স্নানে যেতে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনার ঝঙ্কার, "তোমাকে কে সর্দারি মারতে বলেছে? মেয়েদের ব্যাপারে একদম নাক গলাবে না।"

"বা রে, মেয়েটার কষ্ট হচ্ছে, বলব না?"

"দরদ দেখে মরে যাই! কাটো তো। যা করছিলে, তাই করো। সিগারেট ফোঁকো।"

বাক্যের অভিঘাতেই বুঝি ছিটকে গেল প্রতীক। কোনার খাট-ড্রেসিংটেবিলওয়ালা ঘরটায় গিয়ে বসেছে। পিছন পিছন সৌমেনও হাজির। সঙ্গে প্রতীকের দাদা আর বড় ভায়রা।

সৌমেন তারিফের সুরে বলল, "বড়দাকে কিন্তু ধুতিতে বেশ মানিয়েছে।"

"বাঙালিদের চেহারায় ধুতিটাই সুট করে, বুঝলে? বিকেলে তো পরবে, দেখো তোমাদেরও খাসা লাগবে।"

"সরি, আমি ধুতিতে নেই, চন্দন দু'হাত জোড় করল—পাজামা-পাঞ্জাবি এনেছি..."

"উঁহু। তুমি না মেয়ের মেসো? কী ঠিক হয়েছে মনে নেই? ছেলের প্রতিটি শ্বশুরেরই ইউনিফর্ম আজ ধুতি-পাঞ্জাবি।"

"অফ কোর্স। সৌমেন সায় দিল—অবাঙালি কুটুমদের স্বাগত জানাতে ধুতিই আমাদের আদর্শ পোশাক।"

"পরতে না জানলে আমি পরিয়ে দেব। প্রশান্ত চোখ টিপল, কোঁচাখানা হাতে নিয়ে হাঁটলে দিব্যি একটা জমিদার-জমিদার মেজাজও আসবে।"

"সামলাতে পারব? পিউয়ের বিয়ের সময়ে যা ল্যাজে-গোবরে হয়েছিলাম!"

দরাজ গলায় হেসে উঠল প্রশান্ত। হাসতে হাসতেই প্রতীককে বলল, "দু'দিন ধরে নাকি তুই খুব সিগারেট খাচ্ছিস?"

রঞ্জনা সর্বত্র গেয়ে বেড়াচ্ছে বুঝি? প্রতীক ভ্যাবলা গলায় বলল, "যা টেনশন যাচ্ছে!"

"এখন তোর সাত খুন মাপ। কাল অবধি খেয়ে নে, তারপর ফের কন্ট্রোল। আপাতত আমাকে একটা ছাড় তো।" ভাইয়ের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল প্রশান্ত। দেখাদেখি চন্দনও। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে প্রশান্ত ফের চন্দনকে ধরেছে, "ধুতি সামলানোর কথা বলছিলে না?"

"হ্যাঁ দাদা, ঠিক কনফিডেন্স পাই না।"

"ঘাবড়াও মৎ। ইচ্ছে থাকলে মানুষ সব পারে। এই তো দ্যাখো না আমাদের মিমলিটা...আইবুড়োভাতের দিন শাড়ি পরল, এখন পরে আছে, বিকেলে তো জবড়জং সাজবে..."

"সত্যি, মিমলি কিন্তু আমাদের হতবাক করে দিয়েছে। চিরটাকাল শার্টস-থ্রি কোয়ার্টার-জিনস ছাড়া কিচ্ছুটি গলাল না, সে তো দেখি দিব্যি শাড়িবতী হয়ে উঠল!"

"ভাবা যায় না। ওকে তো সেই ছোট্ট থেকে দেখছি...কিছুতেই মেয়েদের ড্রেস পরবে না, মেয়েদের সঙ্গে খেলবে না, চুলটাকে কখনও ঘাড় পেরতে দিল না, হাবেভাবে চলনে-বলনে এতটুকু মেয়েলিপনা নেই!"

"মিমলি আদৌ বিয়ে করবে কি না, তাই নিয়েই আমার ধন্দ ছিল।"

"অথচ দ্যাখো, সেই মেয়েও প্রেমে পড়ল তো!"

"তাও যেমন-তেমন নয়। স্যাটেলাইট প্রেম। কম্পিউটারে চ্যাট করতে করতে মন দেওয়া নেওয়া।"

চুপচাপ মন্তব্যগুলো শুনছিল প্রতীক। বিয়েবাড়িতে মিমলির প্রেম এখন হট টপিক। স্বাভাবিক। বিয়ে প্রসঙ্গ পাড়লেই যা মুখ বেঁকাত মেয়ে! সেই মিমলির কী পরিবর্তন! স্নিকার ছাড়া যে চলত না, তার পায়ে এখন বাহারি চপ্পল। রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করবে বলে বার কয়েক বায়না জুড়েছিল মাত্র, রঞ্জনা

শুভ নববর্ষ উপলক্ষে
গুজরাটের হস্ত শিল্প, বস্ত্র শিল্প,
রেডিমেড গারমেন্ট, ফার্নিচার ইত্যাদি
ও আরো বৈচিত্রপূর্ণ সামগ্রী নিয়ে
গারভী-গুজ্জরী আপনাদের সকলকে
জানায় সাদর আমন্ত্রণ

গারভী-গুজ্জারী
(গুজরাট সরকার দ্বারা অনুমোদিত)
দক্ষিনাপণ, ঢাকুরিয়া
কলকাতা - ৬৮, দূরভাষ : ২৪২৩৭১১৭
হ্যান্ডলুম হাভেলী
উত্তরাপণ, কলকাতা - ৫৪ ফোন·. ২৩৫৫২১৬৩

বছরভর কেনাকাটা

চোখ পাকাতেই অনুষ্ঠানে ঘাড় নেড়ে দিল। এমনকী হাতে-পায়ে মেহেন্দি পর্যন্ত লাগিয়ে ছাদনাতলায় বসতে রাজি!

প্রতীকের এখনও যেন বিশ্বাস হয় না, মিমলি প্রেমে পড়ল?

রোহনের সঙ্গে মিমলির আলাপ চার বছরের। অবশ্যই বাতাসে বাতাসে। বছর খানেক আগে যন্ত্রগণকের মনিটরেই প্রোপোজ় করেছে রোহন। মিমলির সম্মতি পেয়ে স্বয়ং কলকাতায় এসে উপস্থিত। তার চেহারা দেখে, তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে রঞ্জনাও ডগমগ। প্রতীকই বা কোন যুক্তিতে আপত্তি জানাবে? ছেলে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার, ছেলের বাবা এক্স আর্মি-ম্যান, দিল্লির সরোজিনী নগরে নিজেদের বাড়ি...এমন সুপাত্র বাঙালি না হলেই বা কী ক্ষতি। রঞ্জনা-প্রতীক গিয়ে দেখেও এল পরিবারটিকে। খারাপ লাগেনি, তবে দু-চারটে ব্যাপারে খুঁতখুঁতুনি ছিল। ফিরে দিনক্ষণ স্থির করার আগে মেয়ের সঙ্গে কথা বলল খোলাখুলি।

জিজ্ঞেস করল, "জানিস তো, ওরা ভেজিটেরিয়ান? তোর চলবে তো?"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেয়ের জবাব, "নো প্রবলেম। রোহনের সঙ্গে কথা হয়েছে, আমরা বাইরে বেরিয়ে খাব।"

রঞ্জনা বলল, "শ্বশুরবাড়িতে তোমার শার্টস-টিশার্ট কিন্তু চলবে না। সালোয়ার-কামিজ পরতে হবে।"

অমনই মেয়ের কী বাধ্য উত্তর, "একটু-আধটু তো মানিয়ে নিতেই হবে মা। রোহন বলেছে পরে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তার পরও বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ, "তোর শ্বশুরমশাই বোধহয় মেয়েদের চাকরি করা পছন্দ করে না রে। ঘরে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠবি না তো?"

মেয়ে ফিক করে হাসল, "রোহন বলেছে ওটা ওর ভাবনা। বাবা-মাকে ঠিক ম্যানেজ করে নেবে।"

একেই বুঝি বলে প্রেমের মহিমা। কী আস্থা রোহনে, বাপস্! চিরজীবন এমনটা থাকলে হয়। প্রতীকও তো ভালবেসে বিয়ে করেছিল...মাঝবয়সে পৌঁছে কী দেখছে? প্রতীকের ওপর কণামাত্র ভরসা আছে রঞ্জনার? সারাদিনে একটা সুমিষ্ট বাক্যবিনিময় হয় কি দুজনের?

দরজায় বান্টি উঁকি দিচ্ছে, "কাকাই, এক সেকেন্ড..."

প্রতীক উঠে গেল, "কী রে?"

"ডেকরেটার কিছু পেমেন্ট চাইছিল।"

"কেন? ওকে তো একবারে দেওয়ার কথা!"

"সকালে ওকে তিনখানা কার্পেটের অর্ডার দেওয়া হল না? আর দুটো ঝাড়বাতি? ওর নাকি স্টকে নেই, কার থেকে যেন আনবে।"

"ও...কত চায়?"

"হাজার দুয়েক।"

"তোর কাকিমাকে গিয়ে বল, দিয়ে দেবে। বলেই থমকেছে প্রতীক—"থাক, আমি দেখছি।"

দোতলার প্রকাণ্ড হলঘর, যেখানে বিয়ের মণ্ডপ হবে, সেখানে এখন জমাট আসর। একদিকে চেয়ার পেতে বান্টির বউ, ভুটকানের বউ, পিউ, তুলতুলদের দল আর তাঁদের খানিক তফাতে রুনুবউদি, রঞ্জনা, আর প্রতীকের শ্বশুরবাড়ির গ্যাং। কচিকাঁচারা ছুটে বেড়াচ্ছে এলোমেলো।

ইতিউতি চোখ চালিয়ে প্রতীক জিজ্ঞেস করল, "মিমলি কোথায়?"

বউদি বলল, "এই তো স্নান সেরে বেরল। রেস্ট নিচ্ছে।"

"মেয়েটা দুপুরে খাবে তো কিছু?"

"দেখি, নিময় বাঁচিয়ে কতটুকু কী দেওয়া যায়।"

"গুলি মারো নিয়মে। আজকালকার দিনে ও সব কেউ মানে নাকি?"

"তোমার মেয়েকে সে কথা বোঝাও। সে তো আজ নিয়মের পরাকাষ্ঠা বনে গেছে। শরবত ছাড়া কিচ্ছু ছুঁচ্ছে না।"

যত্ত সব বাড়াবাড়ি। বলতে গিয়েও গিলে নিল প্রতীক। চোখ সরু করে রঞ্জনাকে ডাকল, "একবার এসো তো।"

রঞ্জনা নড়ল না। টেরচা চোখে প্রশ্ন হানল, "কেন?"

"তোমাদের সাজঘরের লকারটা একটু খুলতে হবে।"

"তা আমার দরকার কী? চাবি নিয়ে যাও।"

"আহা রঞ্জু, বলছে যখন, যা না। তোর সঙ্গে হয়তো নিভৃতে দুটো আলাপ সারতে চায়।"

"কচুপোড়া। টুকুন জিরোচ্ছি তো, সইছে না। কোমর থেকে চাবির গোছা খুলে ঝনাৎ করে ছুঁড়ে দিল রঞ্জনা। চোখ পাকিয়ে বলল, "দয়া করে তালজ্ঞান বজায় রেখো। লকারে গয়নাগাঁটি আছে, একটাও যেন বাইরে না পড়ে।"

"সেই জন্যই তো বলছি, নিজে এসে খোলো।"

"আশ্চর্য, ছোট্ট একটা কাজও সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে না? সবেতে আমি? সবেতে

Jaya's
Beauty Clinic & Spa
A unit of
Jaya Basu Roychowdhury
(Beautician & Skin Therapist)

Jaya's Beauty Clinic & Spa
36, Debendra Ghosh Road, Kolkata-25
(Near Netaji Bhawan Metro
beside Gupta Chaki shop)
Ph. : 3221 8500, 98300 84762
98362 23092, 98311 48849
Email : jayasreebasuroychowdhury@yahoo.com

- Bridal make-up
- Mehendi Art
- Skin Treatment with peeling
- Specialist in different saree wearing

Jaya's Beauty Institute
38, Lake Gardens, Block C, Flat No. 30
Near Lake Gardens Post Office
Bus Stop - Lords Crossing
Kolkata-26
Ph. : 033-6451 5047, 98300 84762
98362 23092, 98311 48849
Email : jayasreebasuroychowdhury@yahoo.com

আমাকে চাই?"

"তোমাকেই তো চাইবে রঞ্জনা। আর কাউকে চাইলে কি তোমার ভাল লাগত?" বউদির বলার ঢঙে ঘর জুড়ে হাসির রোল। শালিরা তো রীতিমত কনসার্ট বাজাচ্ছে। প্রতীক পালিয়ে বাঁচল। দুপদাপ পায়ে সাজঘর। লকার খুলে দু'হাজার নয়, দু'খানা একশো টাকার বান্ডিল সটান পকেটে পুরেছে। এখন মাঝে মাঝেই এটা-ওটার জন্য লাগবে, বার বার ওই মহিলার কাছে ছোটার দরকারটা কী!

চাবি ঝটাকসে ফেলে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে প্রতীক, পকেটে মোবাইল সরব। নামটা দেখে নিয়ে প্রতীক বোতাম টিপল, "কী রে ভুটকান, কোথায় তুই?"

"এই তো...গেস্টহাউস থেকে বেরচ্ছি।"

"বরযাত্রীদের লাঞ্চ?"

"রেডি, ওদের বসিয়ে দিয়েছি।"

'গাড়িগুলো সব আছে তো ওখানে?"

"ফোর্থটা নিয়ে আমি ফিরছি। পৌঁছে ব্যাক করিয়ে দেব।"

"ওরা কখন রওনা দেবে, কিছু বলল?"

"অ্যারাউন্ড সিক্স। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার তো সাতটায় আসবে, অতএব ওই ছ'টাই ঠিক আছে, কী বলো?"

"হ্যাঁ, এসে একটু স্ন্যাকস-ট্যাক্স খাবে...তারপর..."

"আর একটা কথা, পিসাই। রোহনের বুয়াজি জানতে চাইছিলেন শাদিটা কেন ওদের সিস্টেমে হচ্ছে না..."

"ডিসিশন তো আগেই হয়ে গেছে। রোহনের মা'ই তো বাঙালি বিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন।"

"দেখো, এই নিয়ে আবার না কোনও ক্যাচাল হয়...ছাড়ছি।"

ওফ্, ফের একটা উটকো টেনশন! একেই এত অজস্র ফ্যাচাং পাক খাচ্ছে মাথায়! ডেকরেটারের বায়নাক্কা মিটিয়ে প্রতীক পুরুষমহলের জমায়েতে ফিরল। সেখানে এখন জোর ডিউটি ভাগ চলছে। পরিচালনায় দুই সিনিয়ার। প্রশান্ত আর চন্দন। কাজ এখনও হাজার গণ্ডা। বিয়েবাড়ি সাজানো অনেকটাই বাকি, মণ্ডপ বানানো হয়নি, ছাদনাতলা আধাখেঁচড়া পড়ে, বরের গাড়ি সাজানোর জন্য পাঠাতে হবে...কে কোন ভারটা নিচ্ছে, ছকা হয়ে গেল মোটামুটি। সন্ধেবেলার দায়িত্বও প্রশান্ত বুঝিয়ে দিল সকলকে। কে কে বর আনতে যাবে, কে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে পাকড়াও করে আনবে, কার কার ওপর অতিথি অভ্যর্থনার দায়িত্ব, এ সব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বিস্তর। শুনতে শুনতে প্রতীকের বুক যেন আরও দুরুদুরু। শেষমেশ সব ভালয় ভালয় চুকবে তো?

মধ্যাহ্নভোজের পর সত্যি সত্যিই চারদিকে সাজো-সাজো রব। ইলেকট্রিশিয়ান আলো সেট করছে, ফুলওয়ালা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে পুষ্পসজ্জায়, পিউ-তুলতুলদের সঙ্গে পার্লারে বউ সাজতে গেল মিমলি, ডেকরেটারের ঠাইঠকাঠক চলছে, বুফের টেবিল পেতে ফেলল কেটারার—যাকে বলে একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতা। এরই মাঝে অম্রাণের বিকেল কখন যে হুশ্ করে উধাও!

জিরো আওয়ার এগিয়ে আসছে দ্রুত। বর আনতে রওনা দিল সৌমেন আর ভুটকান। কুসুমশোভিত গাড়িটা দৃষ্টির আড়াল হতেই প্রতীক আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছে। চোরা বিষাদটা আবার হানা দিচ্ছে যেন। চলে যাবে মেয়েটা? চলেই যাবে?

পিঠে হঠাৎ বড় শ্যালিকার হাত। ঘিয়ে রং বেনারসি আর দুল-নেকলেসে বেশ ঝকমক করছে বড়দি। চোখ ঘুরিয়ে প্রতীককে বলল, "এখনও দাঁড়িয়ে কেন?"

"এই তো..এবার ড্রেস করব।"

"তার আগে একবার তোমার বউয়ের কাছে যাও। কল দিয়েছে।"

"ওখানে তোমরা সাজগোজ করছ...আমি গিয়ে কী করব?"

"বলছি যখন, যাও। খুব জরুরি দরকার।

পায়ে পায়ে এগোচ্ছিল প্রতীক, পিছন থেকে ফের অর্চনার টিপ্পনী, প্রেমালাপটা একটু নিচু কণ্ঠে করো কিন্তু।"

আবার সেই হাসির বিস্ফোরণ। প্রতীকের মেজাজ পলকে কষটে। সে আর রঞ্জনা সকলের হাসির খোরাক হয়ে উঠছে কি...? কেন যে রঞ্জনাটা এতটুকু বুঝদার নয়? দোতলায় উঠতেই রঞ্জনার মুখোমুখি। প্রতীক ঈষৎ চমকাল। কেমন যেন শুকনো দেখাচ্ছে না রঞ্জনাকে! মেয়ে চলে যাচ্ছে বলেই কি? প্রতীক গুমগুমে গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"একটা বড় ভুল হয়ে গেছে গো। খপ করে বরের হাতটা চেপে ধরেছে রঞ্জনা। ঢোক গিলে বলল, "আমার জড়োয়ার সেটটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।"

"তো?"

"কবে থেকে ভেবে রেখেছি, নতুন

জামদানির সঙ্গে ওটা আজ পরব...”
“অন্য গয়না নিশ্চয়ই এনেছ? সেগুলো পরো।”
“সীতাহার তো পরছিই। চুড়ি, চুড়, বালাও। রঞ্জনার মুখ করুণ—কিন্তু...জামাইবরণ করার সময়ে ওই হারটা না থাকলে গলাটা কেমন খালি খালি দেখাবে না? ব্রেসলেটেও তো হাত আরেকটু ভরে।”
প্রতীক দুম করে রেগে গেল, “অত যদি খুঁতখুঁতুনি, ভুলে যাও কোন আক্কেলে?”
“বেরনোর মুখে তুমি এমন তাড়া দিলে...”
“অ, এটাও আমার দোষ?”
“তা কেন! বলছি...তাড়াহুড়োয় মানুষের ভুলচুক তো হয়ই। রঞ্জনা চাপ দিল প্রতীকের হাতে—অ্যাই...প্লিজ...”
“এখন কী করে যাব? প্রতীক ঝেঁঝে উঠল, অলরেডি লোকজন আসা শুরু হয়ে গেছে...”
“তুমি ছাড়া আর কে খুঁজে আনতে পারবে বলো?”
“কিন্তু...কোনও গাড়িও তো নেই...”
“আহা, কতই বা দূর! রিকশয় যাও। আসতে-যেতে বড়জোর বিশ-পঁচিশ মিনিটের তো ব্যাপার।”
“অত তাড়াতাড়ি হয় নাকি? তিনতলা উঠতে হবে, দরজা খুলতে হবে, আলমারি ঘাঁটতে হবে...”
“ঠিক আছে, যাও। রঞ্জনা হাতটা ছেড়ে দিল। ফোঁস করে একটা দেড়মণি শ্বাস ফেলে বলল, “বুঝেছি। ওই গয়না পরে জামাইবরণ আমার কপালে নেই।”
মনের ওপর কী চাপ যে ফেলতে পারে রঞ্জনা! অগত্যা প্রতীককে বেরতেই হয়। হাঁচোরপাচোর করে ছুটতেই হয়। ছাপ্পান্ন বছর বয়সে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে ভাঙতেও হয় সিঁড়ি। বাক্স বগলে হাঁপাতে হাঁপাতে ফের রিকশ ধরেছে।
প্রতীক মনে মনে ফুটছিল। বিয়েবাড়ির কাছাকাছি এসে ক্রোধ খানিকটা প্রশমিত হল। যাক, বরের গাড়ি আসেনি এখনও। তবে সানাই বাজতে শুরু করেছে। মন দুলিয়ে দেওয়া একটা সুর ভাসছে বাতাসে। পলকের জন্য প্রতীকের মনে হল, আলোর মালায় সেজে ওঠা এ বুঝি কোনও অন্য বিয়েবাড়ি। চেনাও বটে, আবার যেন অচেনাও।
রিকশভাড়া মিটিয়ে প্রতীক বিয়েবাড়িতে ঢুকল। সামনেই দাদা। ভুরু কুঁচকে বলল,“তুই এখনও এই পোশাকে?”
প্রতীক অপ্রস্তুত মুখে বলল, “একটা কাজে গিয়েছিলাম।”
“ওরা তো এক্ষুনি এসে পড়বে।”
প্রতীক মনে মনে বলল, এলেও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। যতক্ষণ না মহারানির জড়োয়ার সেট পরা হয়, ততক্ষণ জামাইয়ের নো এনট্রি।
মুখে বলল, “আমার দু’মিনিট লাগবে, তৈরি হয়ে নিচ্ছি।”
“যা-যা, দেরি করিস না। আর হ্যাঁ, ওপরে একবার মিমলিকে দেখে আয়।”
“কেন?”
“মেয়েটাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে রে। চিনতেই পারবি না। কে বলবে এ আমাদের সেই গেছো কন্যে?”
শুনে বেশ পুলকিত হল প্রতীক। কেউ মিমলির প্রশংসা করলে কী যে আনন্দ হয়। মিমলি তার বেশি আপন বলেই কি...হ্যাঁ, মায়ের চেয়ে বাবার সঙ্গে বেশি ভাব মিমলির। রঞ্জনা এক ঘরে টিভি সিরিয়াল দেখে, তো অন্য ঘরে বাপ-মেয়ে ক্রিকেট-ফুটবল। রেস্টুরেন্টে গেলে মা চাইনিজ খাবে, বাপ-মেয়ে মোগলাই। মনের-প্রাণের যত কথা, বাবার সঙ্গেই হয় মেয়ের। রোহন-উপাখ্যান কাকে প্রথম শুনিয়েছিল মিমলি? বাবাকেই তো।
দোতলায় উঠে রঞ্জনার কাছে যেতে গিয়েও প্রতীক থমকেছে। সামনের ঘরটাতেই লাল সিংহাসনে বসে আছে মিমলি, তাকে প্রায় ঘিরে রেখেছে মেয়েরা। এসে গেছে ভিডিও, ছবি উঠছে জোরালো আলোয়। হঠাৎ মিমলির মুখে দৃষ্টি পড়তেই প্রতীক যেন তড়িতাহত! কে ও? মিমলি? উঁহু, রঞ্জনা! হ্যাঁ, রঞ্জনাই তো! খোঁপা-টোপা পরে, ওড়না লাগিয়ে, গয়নায়, বেনারসিতে, চন্দনে এ তো সেই ঊনত্রিশ বছর আগের নববধূটি।
স্খলিত পায়ে প্রতীক সরে গেল। আস্তে আস্তে রঞ্জনাদের সাজঘরের দরজায়। টোকা দিচ্ছে।
অল্প ফাঁক হয়েছে দরজা। রঞ্জনা মুখ বার করল, “এনেছ?”
প্রতীকের স্বর ফুটল না। একদৃষ্টে দেখছে রঞ্জনাকে।
খপ করে প্রতীকের হাত থেকে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা নিল রঞ্জনা। ফের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে থেমেছে। সরু চোখে বলল, “হাঁ করে তাকিয়ে আছো যে বড়?”
জবাব নেই।
“আশ্চর্য, হল কী তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?”
দু’দিকে ঘাড় নড়ল প্রতীকের। পেন্ডুলামের মতো।
“তা হলে? কী হল, অ্যাঁ?
কী যে হয়েছে, তা কি প্রতীকও জানে! রঞ্জনার মধ্যে মিমলিকে খুঁজছে কি সে? যেমন একটু আগে মিমলির মধ্যে ফিরে এসেছিল রঞ্জনা।
নাহ্, বোঝার দরকার নেই প্রতীকের। বুকের মাঝে যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে, তা পড়ুক না আর কিছুক্ষণ। কিংবা অনন্তকাল।

অলঙ্করণ: অনুপ রায়